ISSN: 2708-3225
Fine Arts Journal
Vol. 05, Nov. 2024

শিল্পী মনিরুল ইসলামের বিমূর্তধারার অন্তর্লীন ছাপছবিঃ একটি নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. হীরা সোবাহান*

[**Abstract**: Bangladesh's artistic quality has established the rich printmaking in the seat of prestige in the international standards, the artist Monirul Islam (17 August 1943) is one of them. His authority on printmaking in Bangladesh is far-reaching. In his own artistic thinking and artistry, the unique medium of etching aquatint, which he has shown the ability to create a new style of classical dimension of Art, is very rare in Art. Especially in the Art of watercolor prints, an incomparable poeticism continues to stir the feelings of Art lovers. He has been living in Madrid, Spain as an expatriate and open artist, but currently he is engaged in Art practice in this country most of the time. The concept of style, content and style of Art of the country and abroad is intertwined in his artistic mind.]

১. ভূমিকা ঃ

প্রবাসজীবনে শিল্পচর্চায় তাঁর কোনো ধরনের অনিহা পরিলক্ষিত হয়নি বরং সদা কর্মবীর এই শিল্পীর ছাপচিত্র সাধনা যেন একক সাংগীতিক সুরের ব্যঞ্জনায় সুষমামণ্ডিত আন্তর্জাতিক পরিসরে। শিল্পী মনিরুল ইসলাম'র শিল্পকর্ম কাব্যিক ও সংগীতের সুর-তাল-লয়ে দীপ্তমান। এদেশের গণ্ডি উপচিয়ে তাঁর ছাপচিত্রকলা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেসমাদৃত হয়েছে। দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অসংখ্য পুরস্কার অর্জন করে এদেশের ছাপচিত্রকলার ভুবনকে মহিমান্বিত করেছেন। তিনি শিক্ষাজীবনে চিত্রকলায় চর্চা করলেও প্রবাসজীবনে তিনি ওবশিরভাগ সময়ই তিনি ছাপছবি নির্মাণে নিবিষ্ট হন। বিশেষ করে ছাইাই ছবির অভিসব কৌশল এচিং এবং অ্যাকোয়াটিন্ট-এ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সৃজন করেন অসংখ্য শিল্পকর্ম। স্পেনে মাদ্রিদে অবস্থানকালে সেখানে এচিংয়ের প্রধান উপাদান জিংক ও কপার প্লেট কাজ করতে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। অনেক উপকরণ নিজেই তৈরি কিরে নিয়েছেন। উপকরণ তৈরির সময় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনিও নতুন কিছু রপ্ত করেছেন। ১৯৭১-এ যুদ্ধের সময়কালে স্পেনে অবস্থান করলেও হৃদয়ে সর্বদা দেশের জন্য প্রাণের আকুতিতে কাতর ছিলেন। দেশের টানে প্রায়ই চলে আসেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরের ব্যবধানে তিনি আবার দেশে ফেরেন। এবার ছয় মাস অতিবাহিত করেন। তাঁর ছাপাইকর্ম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি অনেক সময় রাতে না ঘুমিয়ে কাজ করেছেন ছাপচিত্রকর্মশালায়। প্রথমদিকে তিনি

* প্রফেসর, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ছাপচিত্রকর্মশালায় প্রতিষ্ঠিত ছাপচিত্রীদের তৈরিকৃত প্লেট থেকে প্রিন্ট নেওয়ার কাজ করেন। কাজের ফাঁকে সময় পেলেই তিনি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। এক সময় তাঁর কাজ প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সারিতে স্থান লাভ করে আন্তর্জাতিক ছাপচিত্র প্রদর্শনীতে। এভাবে তাঁর শিল্পকর্ম বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি পায়। এবং বেশ কয়েকটি ছাত্রচিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ডিঙ্গিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করতে সমর্থ হন। আর এভাবেই তাঁর শিল্পিত মননে বিষয় ও আঙ্গিকে নবধারা সৃজন হতে থাকে। এই প্রবন্ধে তাঁর শিল্পের সারৎসার বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

২. ছাপচিত্রের উৎস ও অন্তর্লীন ছাপছবি : বর্তমান বিশ্ব শিল্পসভায় ছাপছবি ইহার করণকৌশগত কারণে আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রেই সর্বপ্রথম ছাপের নমুনার সন্ধান পাওয়া গেছে। অতপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ যে সৃষ্টিশক্তি অর্জন করেছিলো তাতে জন্মনিলো মার্জিতভাব, শৈল্পিক বিন্যাস, রূপের সৌন্দর্যময়তা, সমসাময়িক মার্গীয় বা ধ্রুপদী শিল্পভাবনা। এই চিন্তাচেতনার ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন সপ্তম খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে চীনারা ছাপার কাজে মনোনিবেশ করে। আনুমানিক পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে ইউরোপে শৈল্পিকভাবে আধুনিক ছাপচিত্রকলার বিকাশ ঘটে। ছাপচিত্রকলা, ছাপচিত্র বা ছাপাই ছবি হলো চারুশিল্পের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় শিল্পকৌশল।"ছাপচিত্রকলা" বা ছাপাই ছবি (Fine Art Printmaking)ইহার মানসম্পন্ন করণকৌশলগত প্রয়োগের কারণে একটি অনন্য ও অদ্বিতীয় শৈল্পিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। "Greek *ana,* 'up,''back,' or 'anew'; graphein*,* 'to write"[১] থেকে"Graphikos"এবং এরথেকে ইংরেজি "Graphics" শব্দটির উৎপত্তি। আভিধানিক অর্থ অক্ষর বা লেখা, আঁকা, চিত্র, একাধিক প্রতিরূপ বা অবিকল চিত্র ছাপা বা মুদ্রণ। আভিধানিক অর্থে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রকাশ পেলেও প্রথমদিকে নিছক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এর বহুবিধ ব্যবহারের প্রচলন হয়েছিলো। তাই প্রয়োগ কৌশল ক্ষেত্রে "ছাপচিত্র" (Graphics) শব্দটি প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। বাণিজ্যিক হিসেবে গ্রন্থ, লোগো, টিভি, কম্পিউটার, ফ্যাক্স, কম্পিউটার প্রিন্ট, ফটোস্টেট এবং আবার "চারুশিল্প" (Fine Art) নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষত "ফাইন আর্ট প্রিন্টমেকিং" (Fine Art Printmaking) বোঝাতে "ছাপচিত্রকলা" কথাটি বাংলায় বহুল প্রচলিত।

কাঠ, পাথর, ধাতুপাত বা সিল্ক কাপড়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত ব্লকের পরিতল থেকে কাগজ বা কাপড় বা অন্য কোনো সমতল পরিতলে একাধিক চিত্র ছাপার শিল্পকৌশলকে "ছাপচিত্র" বলা হয়ে থাকে। তবে এই ছাপ নেবার ধারণা অনেক প্রাচীন। গুহাগাত্রে অসংখ্য হাতের ছাপের নমুনা পাওয়া গেছে–যা এখনো দেখা যায় (চিত্র : ১)। এসব হাতের ছাপগুলো অনেকটাই স্টেনসিল বা উন্মুক্ত পদ্ধতির অনুরূপ। সম্ভাবত এখান থেকেই ছাপ নেবার ধারণার উৎপত্তি। মধ্যচীনে ১০৫

[১] "Anagram.", Print and printmaking, Microsoft ® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007. Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.

খ্রিস্টাব্দে ৎসাই লান (Ts'ai Lun) কাগজ আবিষ্কার করেন।[২] কাঠের ব্লক থেকে এক রঙে কাগজে চিত্রের প্রতিরূপ ছাপার কৌশল সুপরিকল্পিতভাবে আবিষ্কার হয় চীনে তাং রাজত্বকালে (৬১৮-৯০৫) খ্রিস্টাব্দে।[৩] এ সময় একই সঙ্গে লেখা ও চিত্র ছাপ প্রক্রিয়ায় ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ "হীরকসূত্র"(Diamond Sutra) কাগজে ছাপা হয়েছিল। এই গ্রন্থের সামনের পৃষ্ঠায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি কাঠখোদাই ছাপচিত্রের নিদর্শন রয়েছে (চিত্র : ২)। মূলত এখান থেকেই উন্নততর পদ্ধতিতে ছাপার সূত্রপাত। চীনের রিলিফ পদ্ধতির ইতিহাস অনুসরণ করেই ৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে জাপানিরা বৌদ্ধ আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধির লক্ষে সর্বপ্রথম প্রমাণিকরণ ছাপ উডব্লক রোবিং (Wood block Rubbing) বা কাঠ বন্ধনী পদ্ধতিতে হাতে ঘষে ঘষে ছাপচিত্র তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে রঙিন কাঠখোদাই প্রকরণে শিল্পীরা উৎকর্ষ সাধন করেন।



চিত্র ১ : কেইভপ্রিন্ট, ২৮০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

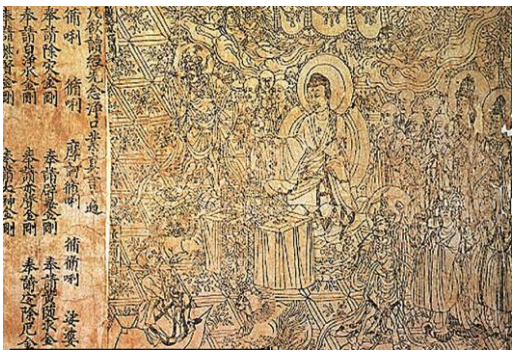

চিত্র ২ : ডায়মন্ড সূত্র, কাঠখোদাই, ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ

ইন্টাগ্লিও বা অন্তর্লীন পদ্ধতি ছাপচিত্রকলার একটি অন্যতম শৈল্পিক ও আকর্ষণীয় মাধ্যম। এটি রিলিফ পদ্ধতির একেবারেই বিপরীত। ইতালিয়ান শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। Intaglio comes from the Italian word intagliare, meaning 'to cut in. অর্থাৎ "Intaglio" শব্দের ইংরেজি আভিধানিক অর্থ হলো অন্তর্লীন, অবতক্ষণ, ধাতুতক্ষণ বা গভীর করে খোদাইকৃত অভ্যন্তর অংশ থেকে ছাপ উত্তোলন। সাধারণত ধাতুপাতের যে অংশটি এনগ্রেভিং বা এসিড (Acid) বাইটিং (Biting)-এ তক্ষণ করে যে নকশা বা চিত্র খঁচিত হয় তার অভ্যন্তর অংশে রঙ বা কালি ঢুকিয়ে পরিতল থেকে অতিরিক্ত কালি ডাবার (Daber) বা নাইলন জাতীয় কাপড়ের সাহায্যে মুছে পরিষ্কার করে "Clothes winger type press" অর্থাৎ এচিং (Etching) প্রেস মেশিনের সাহায্যে ছাপ নেওয়া হয়। এ পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ধাতুপাতের গর্তে ধারণকৃত রঙ বা কালি কাগজে লেগে অংকনকৃত নকশা বা চিত্রের রেখাংশের ছাপ উদ্ভাসিত হয়। ছাপচিত্রের

[২] যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুদ্রণ-শিল্পের গোড়ার কথা* (কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, ১৯৮২), পৃ. ১।

[৩] রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, "ছাপাখানা ঃ চীন থেকে চিনসুরা", *দুইশতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন* চিত্ররঞ্জন বন্দোপাধ্যায় (সম্পা:) কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮১), পৃ. ১৩।

পরিভাষায় এই পদ্ধতিকে "ইন্টাগ্লিও" বা "অন্তর্লীন" ছাপ পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। "অন্তর্লীন" পদ্ধতিতে সাধারণত তামা (Coper), দস্তা (Zinc), অ্যালোমিনিয়াম (Aluminium), লোহারপাত (Iron or Still plate) এবং পিএস প্লেট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে যে মাধ্যমগুলোতে সাধারণত সলভেন্টস (Solvents) বা দ্রাবক ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে- "এচিং" (Etching), "অ্যাকোয়াটিন্ট" (Aquatint), "সফ্টগ্রাউন্ড" (Softground), "ডিপ এচ্" (Deep Etch), "সুগার অ্যাকোয়াটিন্ট" (Suger Aquatint or Lift ground), "ক্রেয়ণ ম্যানার এচিং" (Crayon-manner etching), "রিলিফ এচিং" (Relief etching), "ফটো এচিং" (Photo etching) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ পদ্ধতিকে সাধারণত ভেজা পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে যে সমস্ত মাধ্যমে সাধারণত সলভেন্টস প্রয়োগ হয় না, এ পদ্ধতিকে সাধারণত শুষ্ক পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। এর মধ্যে-"ড্রাইপয়েন্ট" (Drypoint), "মেৎসৌটিন্ট" (Mezzotint), "মেটাল এনগ্রেভিং" (Metal engraving) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩. বিমূর্ত চিত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ

শুধু বাংলাদেশের গণ্ডির মধ্যে শিল্পী মনিরুল ইসলামের চিত্রভুবনের পরিধি সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তাঁর চিত্র-সম্ভার প্রাচ্য দেশিয় শিল্পের এক উচ্চমার্গীয় শিল্পরীতি হিসেবে আন্তর্জাতিক শিল্পাঙ্গনে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তাঁর শিল্পানুভূতিতে স্বকীয় ভাবনা, শিল্পের আঙ্গিক গড়নে মানবিকতা সম্পর্কে সচেতনতাবোধ সর্বদা জাগ্রত–এ সবের মেলবন্ধনে তাঁর সৃজনীশক্তির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে এবং তাঁর শিল্পদর্শন, মমত্ববোধ ও মহানুভূতি তাঁকে বিশ্ব শিল্পকলার পরিমণ্ডলে উচ্চসম্মানে অধিষ্ঠিত করেছে। চিত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক গড়নসম্পর্কে তিনি অন্য এক সাক্ষাৎকারে বিমূর্ত চিত্র প্রসঙ্গে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

> গোলাপ সবাই আঁকতে পারে। দশজনকে আঁকতে দিলে দশজন দশভাবে আঁকবে। কিন্তু গোলাপের গন্ধ? এটাই প্রধান বিষয়। এই যে ধরাছোঁয়ার বাইরে কতগুলো ফিলিংস যেমন–আশা, দুঃখ, আনন্দ এগুলো আঁকতে গেলে বিমূর্ত ফর্ম ব্যবহার করতে হয়। কারণ আশার কোনো রূপ নেই। দুঃখ আনন্দেরও রূপ নেই।[৪]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরেকটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন–

> একজন মানুষের ব্যক্তিগত মনোজগতের গভীর গহনের অভ্যন্তরে জন্ম নেয় সৃজনশীলতা। শিখিয়ে পড়িয়ে কাউকে কবি বা শিল্পী তৈরি করা যায় না। হৃদয়ের গহনে হঠাৎ আলোর ঝলকের মতো বা বিদ্যুৎ রেখার মতোই কোনো ডিজাইন বা কম্পোজিশন হঠাৎ দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। শিল্পী, হয়তো একটি লাইন বা একটি বিন্দু আঁকলেন। আঁকতে আঁকতে হয়তো ধীরে ধীরে পুরো একটি কম্পোজিশন ফুটে উঠলো।[৫]

---

[৪] নাসিমা হক, "মনিরুল ইসলাম : সংবেদনশীলতা মূর্ত যাঁর ক্যানভ্যাসে" *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা , পৃ. ১১৯।

[১০] *তদেব*, পৃ. ঐ।

এই অনুভূতি বিমূর্ত প্রকাশবাদের ধাঁচ বা রীতি সত্তর দশকের মধ্য পর্যায়ে থেকে তাঁর চিত্রতলে আশ্রিত হতে থাকে। এ সময় রং রেখা ও স্পেসের প্রয়োগ কৌশল সমন্বয়ে চিত্র রচনা শুরু করেন। এই দশকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে "জাস্ট বিফোর দি রেইন", "অন দ্য ওয়ে", "ইল কোমিটা", "লা ফেলেস্তা", "অ্যাক্রোবেট", "দি ট্রেপ অব লাভ", "অটোম মিউসিকা নোটস" অন্যতম। এ সময়ের "জাস্ট বিফর দি রেইন" (১৯৭৪) চিত্রটি ৩৩×৪৫ সেমি উল্লম্বে এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রকরণে নির্মিত। সাধারণত অনেক সময় বৃষ্টির পূর্বে আকাশে রংধনু বা নানা বর্ণের আভায় একটা বিশেষ ইলোশন যোজনা হয়। সেই অনুভূতিকে শিল্পী এতে উদ্ভাসন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। চিত্রের নিম্নাংশের বামপার্শ্বে কয়েকটি বর্ণের ব্যঞ্জনায় কোনো বস্তুর ফর্ম সৃষ্টি হয়েছে, যাতে মনুষ্য ফিগার বিমূর্ত বিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। উপরাংশে খয়েরি কালো বর্ণের পর্দা ভেদ করে খন্ডিত চাঁদের আলো উঁকি দিচ্ছে, সম্ভবত মেঘের আড়ালে চাঁদের অবস্থান। চিত্রের এই চাঁদকে কেন্দ্রীভূত করে আরো কয়েকটি চাঁদ নীল, হলুদ ও বেগুনী বর্ণে আকীর্ণ। একই সঙ্গে বামপার্শ্বে মনুষ্য ফিগার ভঙ্গুর কমলা ও হলুদ বর্ণে তিনটি বেগুনী ফর্ম গঠিত হয়েছে। চিত্রের নিম্নাংশে হালকা নীল বর্ণে শায়িত মনুষ্য ফিগারের বিমূর্ত অবয়ব পরিস্ফুট। কালো বর্ণে দিগন্তরেখায় সূর্য চিত্রায়িত হয়েছে। চিত্রের ডানপার্শ্বে জ্যামিতিক ভঙ্গুর রেখায় খয়েরি, কমলা ও সবুজাভ বর্ণ বিভায় আশ্রিত হয়েছে। স্পেস ছেড়ে হালকা অ্যাকোয়াটিন্ট বিন্দু বিন্দু বৈশিষ্ট্য এবং ছন্দায়িত ভঙ্গুর রেখা সমন্বয়ে চিত্রভাষা নান্দনিক সৌন্দর্যে পরিস্ফুট হয়েছে। যেন এক পশলা বৃষ্টির আড়ালে কবিতার পংক্তি আক্ষরিকে প্রকাশ পেয়েছে (চিত্র ৩)।

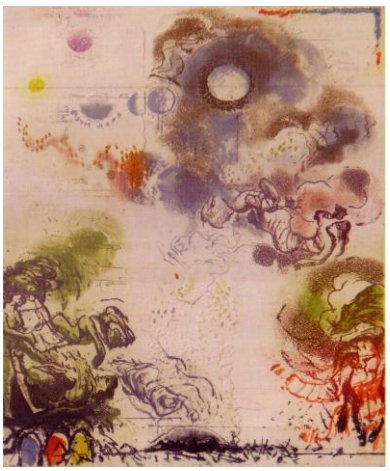

চিত্র ৩ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম
জাস্ট বিফোর দি রেইন,
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৬৮×৫৩ সেমি, ১৯৭৪

শিল্পীর পথ বন্ধুর। বহু দূরের যাত্রী তিনি। কাল্পনাশ্রিত সুদূর প্রান্তের দুস্তর পারাপারের প্রত্যাশায় শিল্পী মনিরুল ইসলাম "অন দি ওয়ে" (১৯৭৫) চিত্রটি ৩৭×৭৬ সেমি আয়তনে আনুভূমিকে উপস্থাপন করেছেন (চিত্র ৪)। বহু বর্নিল রাস্তার পথ। হলুদ, হালকা নীল, বেগুনী, সবুজ, খয়েরি, হালকা কমলা বর্ণস্তর পরস্পর বিন্যস্ত বাদামি জমিনের পটভূমিতে। বর্ণগুলো যেন নানা পথের ফর্মে বিভাজিত হয়ে পথের দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। কালো বর্ণের ছন্দায়িত ভঙ্গুর, মোটা ও সরু রেখাগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন সূচিত হয়েছে। অপার্থিব পথের শোভন পথ যেন কোনো আগন্তকের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন। পশ্চাৎপটের কোথাও হালকা কালো বর্ণে বিন্দু বিন্দু টেক্সচার বৈশিষ্ট্য চিত্রসমূহে বিশেষ "ইলোশন" বা বিভ্রম যোজনা করেছে। এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্টের সুকৌশল প্রক্রিয়ায় অকল্পনীয় সৌন্দর্যময়ে চিত্রটি পরিস্ফুটিত। রংয়ের বিভায় শিল্পী মত্ত। রং আর রেখায় খঁচিত অনুভূতি যেন এচিং বা তক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে আন্দোলিত করে। এর প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর "লা ফেলেস্তা" (১৯৭৬) চিত্রটিতে। ৫০×৬৬ সেমি আয়তনে অনেকটা উল্লম্বে উপস্থাপিত। এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রক্রিয়ায় রচিত। "লে ফেলেস্তা" শব্দটি ফেঞ্চ ভাষায় প্রকাশিত। সীমিত পরিসরে শুধুমাত্র কয়েকটি বর্ণ ও ফর্মে চিত্রতল গঠিত হয়েছে। চিত্রের তিনদিক থেকে সাদা বর্ণে তিনটি খ্রিস্টমাস প্রতীক ইমেজ প্রকাশ পেয়েছে। উপরাংশ থেকে নীলবর্ণে উল্লম্বে আরেকটি ক্রস প্রতীক নীচেরদিকে নেমে এসেছে। দুটি হালকা লাল বর্ণের বস্তুর গড়ন দৃশ্যমান, যাকে শিল্পী হয়তো সূর্যের প্রতীক হিসেবে প্রকাশ করেছেন। কমলা, হলুদাভ, সবুজাভ ও নীলাভ বর্ণের প্রয়োগে কোথাও কোথাও "ফর্ম" বা আকৃতি গঠিত হয়েছে। সমগ্রচিত্রে অ্যাকোয়াটিন্ট প্রকরণের সুদক্ষ প্রয়োগে অসংখ্য "ডট" বা বিন্দুর বুনট বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল। কালো বর্ণের ব্রাশিং স্ট্রোকে ভঙ্গুর ও ছন্দায়িত বলিষ্ঠ রেখা কখনো সরু কখনোমোটায় পরিস্ফুট হয়েছে, যাতে কাব্যিক ছন্দের স্তবকগুলো একটির পর একটি চিত্রভাষায় "রিসাইটিং" বা আবৃত্তি হয়েছে–এমনটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে (চিত্র ৫)।



চিত্র ৪ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, অন দি ওয়ে,এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৩৭×৭৬ সেমি, ১৯৭৫



চিত্র ৫ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, লা ফেলেস্তা
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৫০×৬৬ সেমি, ১৯৭৬

শিল্পী মনিরুল যে কাব্যিক অনুভূতি সংবেদনশীলপ্রবণ, তার প্রমাণ মেলে তাঁর "দি ট্রেপ অব লাভ" (১৯৭৭) চিত্রটিতে। চিত্রটি ৫০×৭৫ সেমি আয়াতনে আনুভূমিকে এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করেছেন। পুরোচিত্রটি দুটি প্যানেলে উপস্থাপিত। চিত্রের বামপার্শ্বে জ্যামিতিক ফর্মে সরু মোটা কালো রেখায় এবং কমলা, বাদামি, বেগুনী ও হলুদাভ বর্ণে বিশেষ বস্তুর গড়ন সৃষ্টি হয়েছে। চিত্রের মধ্যখানে গাছের গুড়ি সদৃশ বস্তু ও নদীরস্রোত নীল ও বাদামি বর্ণ লেপনে প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রের ডানপার্শ্বে খণ্ডিত হলুদাভ চাঁদ সম্ভবত গাছের গুড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া শেকড় ভালোবাসার কোনো বস্তুটিকে আকড়িয়ে ধরেছে। অর্থাৎ ভালোবাসা কোনো ফাঁদের মধ্যে অন্তরীণ হচ্ছে, এমনটি শিল্পী হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন। ভালোবাসার গানের পংক্তিমালা সাংগীতিক সুরে ব্যঙ্গময় হয়ে উঠেছে। চিত্রের উপরাংশ হালকা বস্তুর ইমেজ জলরং ওয়াশ প্রথায় উদ্ভাসন হয়েছে। চিত্রের নীচের অপর প্যানেলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পংক্তি অত্যন্ত নিখুঁত ও নিপুণভাবে এচিং প্রক্রিয়ায় খঁচিত করে উদ্ভাস করেছেন। কবিতার দুটি চরণ এখানে উপস্থাপিত করেছেন শিল্পী, যাতে অক্ষরগুলোর মধ্যে ছন্দায়িত আকর্ষণীয় ক্যালিগ্রাফির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে (চিত্র ৬)।

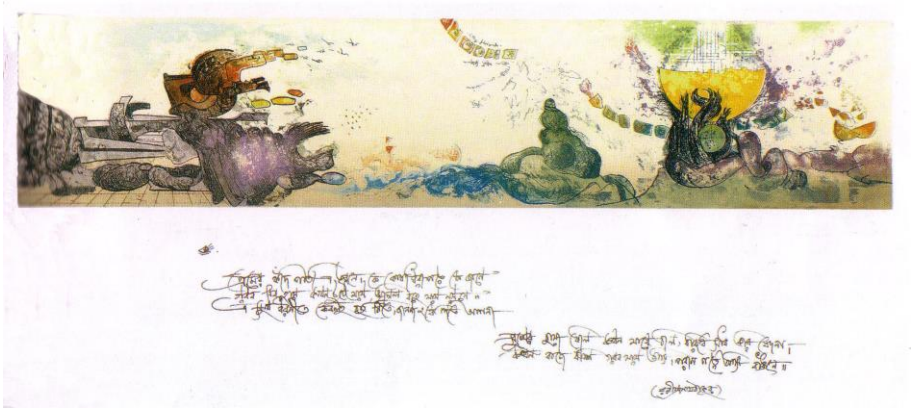

চিত্র ৬ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম,দি ট্রেপ অব লাভ, এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৫০×৭৫ সেমি, ১৯৭৭

আশির দশকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্রের মধ্যে "ক্রিয়েশন অব ন্যাচার", "দি সিটি উইথ হার্টস অ্যান্ড টাইড", "দি প্লান্টস ইন প্লাটস ইন দি স্পেস", "ক্যাসেল অন দি বীচ", "আইসোলেটেড ড্রোফ", "সংস ডি ইলিভেকেশন", "ড্যানসিং ইন দি ফরেস্ট", "লজ ডি আইসিয়ারনাগা" (লাইট অব দি ফেয়ারলি) অন্যতম। "ক্রিয়েশন অব ন্যাচার" বা জ্যাতির সৃষ্টি চিত্রটি তিনি এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট (১৯৮০) কৌশলে ৭৫×৫৬ সেমি আয়তনে উল্লম্বে নির্মাণ করেন। চিত্রটি তিনটি প্যানেল স্তরে উপস্থাপিত। মেঘের ভেতর থেকে সূর্যের আভা প্রকাশমান, যার ভেতর ত্রিভুজাকৃতির জ্যামিতিক গড়ন, পাশে পাখি সদৃশ অবয়ব সাদা ও হলুদাভ স্পেস রেখে শুধু লাল-কমলা, বেগুনী ও নীল পশ্চ্যাৎপটে দৃশ্যমান। নীচের প্যানেল অনেকটা একই সদৃশ হলেও মেঘের নীলাভ অংশ বেশি পরিমাণে এবং তিনটি পাখির অনুরূপ অবয়ব মূর্তিমান। নিচের প্যানেলটি বেশি পরিমাণ আকৃতিতে গঠিত। মেঘ এবং নদী বা পুকুরের নীলাভ জল তরঙ্গে উদ্ভাসিত, যাতে শাপলা বা এ জাতীয় জলজ উদ্ভিজ ফুলের আদল সাদা বর্ণে পরিস্ফুট। গাঢ় নীল পর্দান্তরে হালকা হয়ে মিশেছে। নীলের নীচের অংশ কালো বর্ণে এবং একই সঙ্গে "ডট" বা বিন্দু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বামপার্শ্বে কালো বর্ণে কয়েকটি অজানা বস্তুর গড়ন আভাসিত। চিত্রের ডানপার্শ্বে সূর্য। সূর্যের ভেতর ত্রিভুজ, প্রদীপ সদৃশ ফর্ম যা লাল ও হলুদ বর্ণ লেপনে এবং কালো নীলাভ বর্ণে পাথর সদৃশ কোনো বস্তুর গড়ন চিত্রায়িত হয়েছে। চিত্রে স্পেসকে এমনভাবে ছেড়েছেন, যাতে পূর্ণাঙ্গ চিত্রবলয়ে সুরের বাতাস যেন ক্রিয়ারত এবং সেই বাতাসে সুর-ধ্বনি চিত্রতলের গহিনে অভিঘাত করেছে (চিত্র ৭)।

শিল্পী মনিরুল ইসলাম মাদ্রিদ শহরের বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে নিজের বাসায় ওঠার পর বাসায় ইঁদুরের খুব উপদ্রব ছিল। তাই তিনি সে সময়ের ইঁদুরের উপদ্রবকে তাঁর শিল্পের বিষয়ে স্থান দিয়েছেন। যার নাম দিয়েছেন "দি সিটি উইথ হার্টস অ্যান্ড র‍্যাটস" (১৯৮০)। চিত্রটি ৫৬×৭৬ সেমি আয়তনে আনুভূমিকে এচিং এবং অ্যাকোয়াটিন্ট প্রকরণে উদ্ভাসন করেছেন। শুধু ইঁদুর নয়, শহরের দালান-কোঠা, পার্শ্বে গাছ, ফুলসমেত সাজানো বাগিচা, ট্রানেলও এতে প্রকাশ পেয়েছে। গাঢ় নীল, হালকা নীল, হলুদাভ, মেজেন্টা, আকাশী, কালো-খয়েরি ও গাঢ় বাদামি বর্ণ লেপনে এচিং রেখার বলিষ্ঠতায় এবং অ্যাকোয়াটিন্টের পর্দাস্তরে দালান-কোঠার বিমূর্ত অবয়ব গড়েছেন। মধ্যভাগের কোনো একটি উৎস থেকে আলোর বিকিরণ ছড়াচ্ছে। চিত্রের সম্মুখভাগে সাদা জমিনের ওপর একটি ইঁদুর মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অন্য ইঁদুরগুলো পেছন ফিরে ট্রানেলের ভেতর প্রবেশের জন্য অপেক্ষমান। ইঁদুরটি মরে যাওয়ায় অন্য ইঁদুরগুলো প্রতিবাদে সামিল হয়ে সহমর্মিতায় আবদ্ধ হয়েছে। ইঁদুরগুলো পরিপ্রেক্ষিতে সাদা জমিনের ওপর কালো বর্ণে পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে ট্রানেল ও রাস্তার পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি হয়েছে। ইঁদুরকে কেন্দ্রীভূত করে দুটি পাঞ্জা, একটি পাঞ্জা ট্রানেলের রাস্তার সামনে পড়ে আছে। আরেকটি পাঞ্জা ঝুলন্ত অবস্থায় দৃশ্যমান (চিত্র ৮)। চিত্রের বামপার্শ্বের সাদা জমিনের ওপর ইংরেজি ইটালিক পাটার্নে ক্যালিগ্রাফি দৃশ্যমান। ইঁদুরগুলোর ছায়া সাদা জমিনে পড়েছে। চিত্রের সম্মুখভাগে স্পেস ছাড়ায় চিত্রবলয়ে ভারসাম্যতা অত্যন্ত সুচারুভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

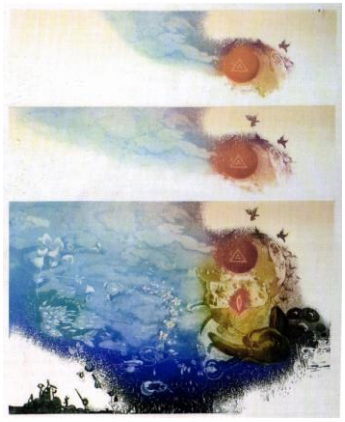

চিত্র ৭ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, ক্রিয়েশন অব ন্যাচার এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন
৭৬×৫৬ সেমি, ১৯৮০

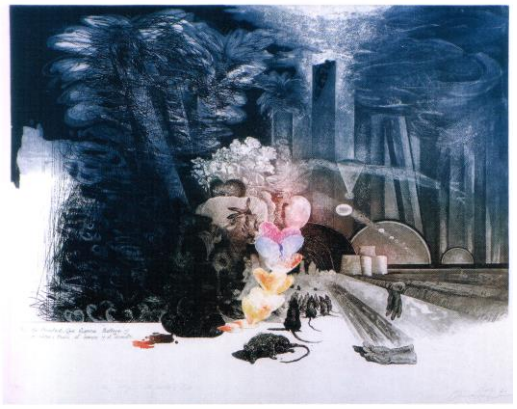

চিত্র ৮ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, দি সিটি উইথ দি হার্টস অ্যান্ড র‍্যাট
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৫৬×৭৬ সেমি, ১৯৮০

নদীর স্রোতের মতো সময় বহে যায়। সময় কারোর জন্য অপেক্ষায় থাকে না। শিল্পী মনিরুল ইসলাম সময়কে ধরতে চেয়েছেন চিত্ররূপ দিয়ে। সময়কে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।

সময়কে স্মৃতিময় করে একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায়। এই ভাবনার স্ফুরণ ঘটেছে তাঁর "টাইম অ্যান্ড টাইড" (১৯৮৪) শীর্ষক ছাপাইকর্মে। চিঠির এনভেলাব, ডিস্ক ক্যালেন্ডার, কাটা কম্পাস, বৃত্ত, ত্রিভুজ ছন্দায়িক রেখার সম্মিলন প্রয়াসে চিত্রের গড়ন সূচিত। অর্ধবৃত্তের মধ্যে অংসখ্য বিন্দু, এনভেলাব সাদাবর্ণে নিখুঁতভাবে উদ্ভাসিত। নীলবর্ণের গাঢ়তায় উল্টো গড়নে ত্রিভুজাকৃতি ফর্ম আকীর্ণ। ক্যাকটাস প্রকৃতির কোনো উদ্ভিজ প্রাণীর অবয়বও এতে দৃশ্যমান, যাতে অসংখ্য রেখার প্রয়োগ লক্ষণীয়। তিনটি কম্পাস তিন ধরনের। এই কম্পাস তিনটি যেন পৃথিবীর সময়ের পরিমাপক। সময়কে ব্যাসার্ধে মেপে প্রয়াসী হয়েছেন শিল্পী। সূক্ষ্ম রেখায় নিখুঁত ড্রয়িং বৈশিষ্ট্য অর্ধবিমূর্তায়নে একটি মানব অবয়ব গড়নও দৃশ্যমান। এচিংয়ে খঁচিত মানবটি যেন সময়কে টেনে ধরে রাখতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছে। ক্লান্তিময় দেহাবয়ব তবু যেন ধৈর্য হারাতে অপরাগতা। শিল্পী সত্যিই সময়ের হাল ছাড়তে রাজী নন। সময়ের মধ্যে সকল ভালো কর্মগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শেষ করতে চান। খয়েরি, বাদামি, কমলা, গাঢ় নীল, কালো, ধূসর, লাল ও সবুজ বর্ণের গাঢ়তার তারতম্যে সময়ের প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন রূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একই সঙ্গে শিল্পের অন্তঃসারকে পরিস্ফুটনে শিল্পী কোনো ধরনের অকৃপণতা করেননি। এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রক্রিয়ায় করণকৌশলগত সুদক্ষতায় চিত্রটি পরিপুষ্ট হয়েছে (চিত্র ৯)।

প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি অরণ্য। এই অরণ্য এখন মানুষের অপরিকল্পিত ভাবনায় নানান জাতের গাছ-গাছড়া বিলুপ্তের পথে। এরই প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি অরণ্য বিষয়ক চিত্র নির্মাণ করেছেন। চিত্রটির শিরোনাম "ড্যান্স ইন দি ফরেস্ট" (১৯৮৮) অর্থাৎ অরণ্যের নৃত্য। এটি ৭৬×৫৬ সেমি আয়তনে উল্লম্বে নির্মিত। এচিংয়ের বলিষ্ঠ প্রয়োগে সোজা, বাঁকা, তীর্যক, অর্ধবৃত্তাকার আড়াআড়ি বৈচিত্র্যময় রেখায় গাছের মাতাল নৃত্য বিমূর্ততায় প্রকাশ পেয়েছে। ধূসর বর্ণের রেখায় গাছের পর্দা বিন্যাসের ওপর কালো বর্ণের সূক্ষ্ম রেখায় গাছের বিমূর্ত বিন্যাস, এর ওপর সবুজ বর্ণের সরু মোট রেখার পর্দাস্তরে চিত্রের সুমিতি রচিত। চিত্রের নিম্নাংশে কমলা বর্ণের রেখার বাহুল্যতা–যা আড়াআড়িভাবে উদ্ভাসিত, যাতে কালো বর্ণের সূক্ষ্ম রেখা ছেদ করেছে। বৈচিত্র্যগামী ছন্দায়িত রেখায় গাছের নৃত্য নান্দনিক অনুভূতিতে প্রাণরসে সঞ্চারিত হয়েছে (চিত্র ১০)।

মাতাল হাওয়ায় অদৃশ্য সুর ধ্বনিত হয় শিল্পী মনিরুল ইসলামের প্রায় প্রতিটি শিল্পকর্মে। এরূপ ধরনের তাঁর একটি অন্যতম চিত্রকর্ম হলো "আইসোলেটেড ড্রোফ" (১৯৮৯)। ৪০×৩০ সেমি আয়তনে চিত্রটি উল্লম্বে এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রকরণে নির্মিত । সমগ্র চিত্রটিতে জলরং ওয়াশের মিষ্ট বর্ণের সুমিতি লক্ষণীয়। হালকা গাঢ় ধূসর বর্ণের রেখা, যাতে দাগ কাটা আছে। খয়েরি, কালো ও হালকা নীল বর্ণের কয়েকটি অদৃশ্য বস্তুর অবয়ব কাল্পনিক গড়নে উদ্ভাসিত। চিত্রের তৃতীয়াংশের নিম্নে "হরিজন্টাল"-এ কয়েকটি ভঙ্গুর ও ছন্দায়িত রেখা দৃশ্যমান। অর্ধ-বৃত্তাকার ফর্ম রেখার বাহুল্যে নীল, কালো, লাল বর্ণে কয়েকটি বস্তুর বাস্তব গড়ন লক্ষণীয়। নীল বর্ণের তারতম্যে আভা ছড়ানো– যেন কোনো অচেনা নদী দূরদেশে প্রবাহমান। অর্ধবলয় থেকে ভঙ্গুর রেখায় ধূসর বর্ণে কোনো ঝরণার স্বচ্ছ জল গড়িয়ে পড়ছে–এমনটিও মনে হয়। চিত্রের বামপার্শ্বে নীচেরদিকে ইংরেজিতে কোনো কবিতার চরণ ক্যালিগ্রাফিতে পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়, ক্যালিগ্রাফির আদলে শিল্পীর স্বাক্ষরও খঁচিত। হালকা মেজাজধর্মী বর্ণ প্রকরণ আর জলরংয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে চিত্রের মধ্যভাগে আলো সূচিত হয়েছে। মনে হয় বৃষ্টির পূর্বে হালকা মেঘমালার আদল

মাতাল হাওয়ার দোলাচলে কোনো অবয়ব শিল্পী এখানে কাব্যিক ভাষায় উপস্থাপন করতে প্রয়াস পেয়েছেন–যা মূলত অদৃশ্যমান কোনো চিত্রকল্পের প্রতিচ্ছবি (চিত্র ১১)।



চিত্র ৯ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম টাইম অ্যান্ড টাইড এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৮৪



চিত্র ১০ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, ড্যান্সিং ইন দি ফরেস্ট এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৭৬×৫৬ সেমি, ১৯৮৮



চিত্র ১১ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম,
আইসোলেটেড ড্রোফ,
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট
৪০×৩০ সেমি, ১৯৮৯

নব্বইয়ের দশকে শিল্পী মনিরুল ইসলামের শিল্পকর্মের কলাকৌশল আর বিষয় ভাবনায় শিল্পের প্রাণরস সুষমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে "লাস্ট জার্নি", "উইন্টার বাটার ফ্লাই", "অহ্ ডিয়ার ব্লু", "ওরিয়েন্টাল মিউজিশিয়ান", "অনলি টু অব আস", "কম্পোজিশন", "লস্ট ওয়ার্ডস", "টান্‌ল অব টাইম", "লা প্রিনসিয়া", "হারমনি অব ডারেক্টরি", "হরিজন গেইম", "দি ট্রি অব দি লাইফ", "সেরেনেটা", "বার্নিং ডেজায়ার", "সংস ডি ইলিভেশন", "নাইট ফ্লাই", "উহকেনড্ ডায়ালগ" ও "উইন্টার নাইট পয়েম" অন্যতম। জলরংয়ের বিচিত্র আভায় পর্দান্তরে চিত্রভাষা তাঁর শিল্পকর্মের অন্যতম প্রাণরস। চিত্রের গড়নে এই প্রক্রিয়া তাঁর সুনিপুণ হাতেই ধরা দেয়। এর ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষণীয় তাঁর "লাস্ট জার্নি" বা শেষ ভ্রমণ (১৯৯১) চিত্রটিতে। ৫৬×৭৬ সেমি আয়তনে এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রকরণে আনুভূমিকে নির্মিত। এই বিশাল পৃথিবীর থেকে আমাদের সকলকেই এক সময় সব কিছু ফেলে রেখে চলে যেতে হবে এক অচীন গাঁয়ে। যেখান থেকে আর ফেরা যায়না। শিল্পীর শিল্পবোধে এই অনুভূতি গঁথিত। সমগ্র চিত্রতল ইয়োলো ওকার বা গাঢ় বাদামি বর্ণস্তরে বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণির

সম্মিলন ঘটেছে (চিত্র ১২)। বিমূর্ত সমুদ্র সৈকতে অবকাশ যাপনে সমুদ্রপ্রেমীদের আনাগোনা বেড়ে যায় বিশেষ কোনো দিনে। সৈকত প্রান্তর পর্যটকদের পদ-চারণায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশকে নান্দনিক দৃষ্টিতে শিল্পী মনিরুল ইসলাম "সেরেনেটা" (১৯৯৮) চিত্রে রূপ দিয়েছেন। চিত্রটি ২৮×৩৪ সেমি আয়তনে আনুভূমিকে উপস্থাপিত, যা এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট ওয়াশ প্রক্রিয়ায় সুকৌশল কারিগরি দক্ষতায় নিটোলভাবে ছেপেছেন। চিত্রের পশ্চাৎপট কালো বর্ণ লেপন করে রাতের আবহের পরিবেশ দৃশ্যমান করেছেন। কালো বর্ণের পর্দান্তরে কোথাও কোথাও হালকা লাল ও হালকা বেগুনি ও খয়েরি বর্ণ মিশ্রিত হয়েছে। যাতে অসংখ্য ছন্দায়িত বহুরূপী রেখার দোলাচলে বৃক্ষরাজির বিমূর্ত অবয়ব গড়ন এবং একই সঙ্গে টেক্সচার ইমেজ বৈশিষ্ট্যে অর্ধখণ্ডিত চাঁদ পরিস্ফুট হয়েছে। চিত্রের জমিনের ওপর ছন্দায়িত ভঙ্গুর বলিষ্ঠ রেখার গতিময়তায় বিচে নৃত্যরত ললনাদের নগ্ন দেহপল্লব বিমূর্ত গড়নে উদ্ভাসিত। কারো কারো দেহ সাদা, নীল, লাল, হলুদাভ, সবুজাভ খয়েরি ও বাদামি বর্ণে নান্দনিক আভায় প্রকাশ পেয়েছে। ললনাদের ছন্দায়িত দেহাবয়বের ছায়া এসে পড়েছে সৈকতের কিনারে জমে থাকা স্বচ্ছ পানির ওপর। জল যেন বর্ণের আভায় বিমূর্ততায় মৃদুমন্দে তরঙ্গায়িত। চিত্রতলে "ফর্ম", বর্ণ ও রেখার সম্মিলনে স্বরলিপির সাংগীতিক সুর মূর্ছনায় শিল্পের সারাৎসার উন্মীলিত হয়েছে। চিত্রতলে শিল্পী যেন নিমগ্নতায় মাতাল (চিত্র ১৩)।

বর্ণিল জীবনযাত্রায় আমাদের সমাজে মানব-মানবী কোনো কিছুর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অভিলাষী। এই অতৃপ্ত চাহিদার ইচ্ছা মানব হৃদয়কুলকে যেন সর্বদা তাড়া করে ফিরে। কাল্পনিক বর্ণিল "ফর্ম" বা

আকৃতি আর রেখার বাহুল্যে নির্মিত তাঁর "ব্যুরনিং ডিসায়ার"(১৯৯৮) বা তীব্র অভিলাষ চিত্রটিতে এই ভাবনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। ৩৪×২৮ সেমি আয়তনে উল্লম্বে চিত্রটি উপস্থাপিত। শিল্পী সূর্যের বর্ণ আভায় কমলা হলুদের মিশ্রণ যোজিত করে অর্ধ বৃত্তাকার, আয়তকার, বৃত্তাকার, ত্রিভুজ উল্লম্ব ফর্মগুলো বলিষ্ঠ কালো বর্ণে বৈচিত্র্যময় রেখায় পরিস্ফুট করেছেন। কোথাও অ্যাম্বুস প্রক্রিয়ায় কাগজ পরিতলে নানা আকৃতির বিন্দু সাদায়, কোথাও বলিষ্ট মোটা ছন্দায়িক রেখা উত্তল হয়ে চিত্রে আভাসিত–যা সমগ্রচিত্রে বিশেষ "ইলোশন" বা অধ্যাস যোজনা করেছে। চিত্রের উপরাংশ থেকে অর্ধ বৃত্তাকার সদৃশ "ফর্ম" অবধি-ধূসর, খয়েরি, সবুজাভ, নীলাভ, বেগুনি ও কালো বর্ণ লেপনে জলরংয়ের আভার বিচ্ছুরণ লক্ষণীয়। যাতে সীমিত "ফর্ম" ও অ্যাম্বোসে পেপারে মোটা সাদা বিন্দু উত্তেলিত। স্পেস ছাড়ায় দিগ্‌বলয় থেকে কালো বর্ণের গাঢ়তার তারতম্যে বহুবঙ্কিম "ফর্ম" ও বর্ণ জলরং ওয়াশ বৈশিষ্ট্যে এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্‌ট প্রকরণের সূক্ষ্ম প্রয়োগে সুচারু ও নান্দনিক কাব্যিকতায় চিত্রভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রে ক্যালিগ্রাফির নিপুণ উদ্ভাসে শিল্পী কুশলী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দায়িত অক্ষরের মধ্যে নান্দনিক সৌন্দর্যময়তা ঢেলে দিয়ে শিল্পী এক বিশেষ শিল্পরস আনয়নে নিমগ্ন হয়েছেন (চিত্র ১৪)।

বিষয়বস্তুর অনুষঙ্গ হিসেবে ক্যালিগ্রাফির বৈচিত্র্যময় প্রকাশেও শিল্পী মনিরুল ইসলাম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। প্রচলিত রীতিতে রেখা ঘুরিয়ে যেসব পরিচিত বর্ণমালা রয়েছে তাতে তিনি তৃপ্ত নন। আরো অনেক অক্ষরসংকেত সৃষ্টি হতে পারে আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগে। তাই রারবার রেখাকে চালিত করেন। বিভিন্ন অভিব্যক্তির অধিকারের লক্ষ্যে। বৃত্ত, আয়তকার বর্গাকার, ত্রিকোণে এসব ধ্রুপদী মানদণ্ডের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন বিষয় উপস্থাপনের প্রয়োজনে।[৬] এই ক্যালিগ্রাফির সুমিষ্ট সুমিতি প্রয়োগ লক্ষণীয় তাঁর "দি শ্যাডো অব দি ওয়ার্ড" বা অক্ষরের ছায়া (২০০১) চিত্রটিতে। চিত্রটি৩৮×৫৩ সেমি আয়তনে আনুভূমিকে নির্মিত। চিত্রবলয়ে জলরং সদৃশ ওয়াশএবং বৈচিত্র্যময় জালিকা ধরনের টেক্সচার বৈশিষ্ট্য সুনিপুণ ও সুচারুভাবে উদ্ভাসিত। চিত্রের কোথাও কোথাও অক্ষরগুলো উল্টো হয়ে প্রকাশমান, যাতে ক্যালিগ্রাফির দৃষ্টিনন্দন অবয়ব সূচিত। পুরোচিত্রতলে বাদামি বর্ণের গাঢ়তার তারতম্যে বর্ণ বিভা ছড়িয়েছে। চিত্রের মধ্যখানে অনেকটা সাদা বর্ণে অক্ষর বিন্যস্ত হয়েছে। যা দৃশ্য ও অদৃশ্যের দোলাচলে দীপ্তমান। মূল চিত্রের প্রান্তসীমা এবড়ো থেবড়ে। যাকে ছাপিয়ে জলরং ইমেজ বর্ণ ছড়িয়ে গেছে এবং যাতেও ক্যালিগ্রাফির সৌকর্য খঁচিত। চিত্রতলের মধ্যখানে আড়াআড়ি ও উল্লম্বে সরলরেখা বিশেষ "ফর্ম" তৈরি করেছে। চিত্রটি ছোট গোলক সদৃশ বস্তুর "ফর্মর"-এর সঙ্গে লাল বিন্দু দৃশ্যমান। গাঢ় খয়েরি বর্ণে দুটি ত্রিভুজাকৃতি "ফর্ম" পরস্পর সংযুক্ত, যা তাড়াভাবে হেলে থাকলেও এতে ভারসাম্যতা পরিলক্ষিত। চিত্রতলের কোথাও কোথাও সোজা, বাঁকা, তীর্যক রেখার প্রয়োগ সুচারুভাবে উদ্ভিন্ন হয়েছে। উপরিতল থেকে একটি লাল বর্ণ সরল রেখা মূল চিত্রের দিকে নমিত। এচিং, অ্যাকোয়াটিন্‌ট ও রিলিফ এচিং প্রকরণে কারিগরি দক্ষতায় সুমিষ্ট বর্ণ আর অক্ষরের বৈচিত্র্যগামী প্রয়োগে চিত্রতলে সারলিক সৌন্দর্যের এক গীত রচিত হয়েছে(চিত্র ১৫)।

---

[৬] খালেদ, "মনিরের শিল্পকর্ম : মর্মে মরমীয়া", *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০০), পৃ. ১৪৪।

মানুষ, পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে সর্বদা দূরত্ব পরিলক্ষিত। এই অবস্থার ফলশ্রুতিতে সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রভাব অবধারিত। শিল্পীর অনুধ্যানে সর্বক্ষণ ন্যায়-অন্যায়, হাসি-খুশি, দুঃখ-কান্নার প্রতিধ্বনি অনুরণিত। ক্রমেই সামাজিক, পারিবারিক সম্পর্কের দেয়ালে ফাঁটল বা চিড় দেখা দিচ্ছে। এই অতল গহিনের ফাঁটলকে শিল্পী সৎ ও সুন্দরের সন্ধানে একত্রীভূত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। যার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় তাঁর "পেয়ার" (২০০২) শীর্ষক চিত্রকর্মে। চিত্রটি এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্‌টি প্রক্রিয়ায় ৬৭×১১৩ সেমি আয়তনে আনুভূমিকে উপস্থাপিত। এই আনুভূমিক আয়তনের চিত্রতলে দুটি আনুভূমিক "ফর্ম" বিভাজিত। দুটি ফর্মের চিত্রতলে জ্যামিতিকতায় বিচিত্র রেখার আঁকিবুকি। একটি রেখার সঙ্গে আরেকটি রেখার সংযোগ, সংঘাত যোজিত হয়ে সম্পর্কের ছেদকে ক্রমান্বয়ে জোড় লাগানোয় উদ্বেলিত শিল্পী। বাদামি বর্ণের পর্দাস্তরের পশ্চাৎপটে কালো বর্ণের রেখার অবয়বে কোথাও কোথাও জ্যামিতিক "ফর্ম" গড়ন দৃশ্যমান। একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত যে ছন্দায়িত রেখায় কোথাও ছেদ ঘটেনি। মনে হয় একটি রেখার ছন্দায়িত খেলাধূলায় অটুট বন্ধন ক্রিয়াশীল। একটি চতুষ্কোণী "ফর্ম" নীলরংয়ের পাশ ঘেষে আরেকটি লাল-কমলা বর্ণের উল্লব "ফর্ম"। একে ঘেষে চিত্রের নীচেরদিকে টিউব আকৃতির হালকা ধূসর বর্ণের একটি ফর্ম দৃশ্যমান। চিত্রের ডানপার্শ্বে আরেকটি টিউব আকৃতির ফর্ম একই বর্ণে দৃশ্যমান। গাঢ়, ধূসর, বাদামি বর্ণের ওপর উল্লম্বে একটি ফর্মের উৎপত্তি হয়েছে হালকা ধূসর বর্ণে, যাতে এক কাব্যিক অনুভূতি সমগ্র চিত্রতলে আলোক দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে। এ যেন মিলনের হরিষে মুখরিত তাঁর রেখাবলয় "ফর্ম" (চিত্র ১৬)।



চিত্র ১২ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম,

লাস্ট জার্নি, এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট,
৫৬×৭৬ সেমি, ১৯৯১

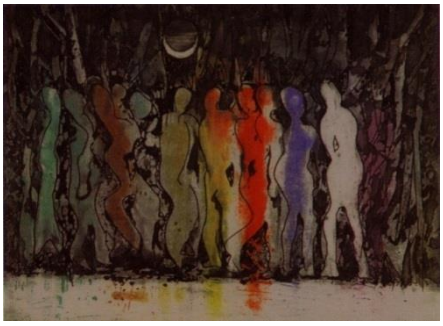

চিত্র ১৩ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, সেরেনেটা,
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট
২৮×৩৪ সেমি, ১৯৯৮



চিত্র ১৪ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম
ব্যুরনিং ড্রেসায়ার
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট
৩৪×২৮ সেমি, ১৯৯৮

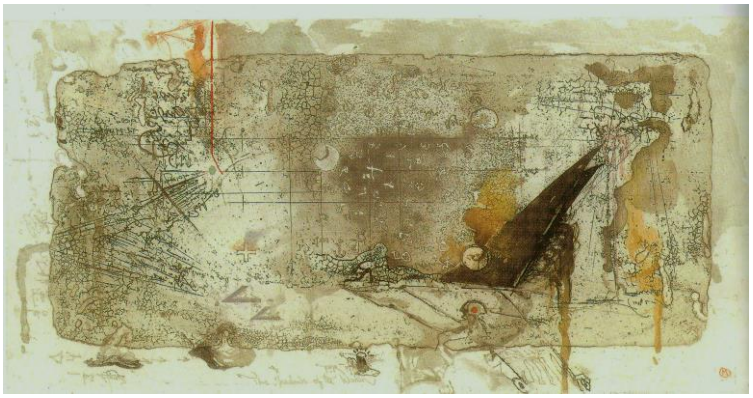

চিত্র ১৫ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, দি শ্যাডো অব দি ওয়ার্ড,
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৩৮×৫৩ সেমি, ২০০১

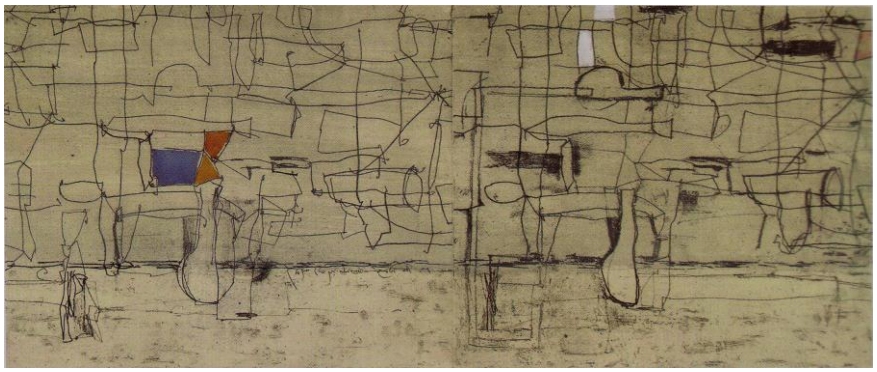

চিত্র ১৬ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম,পেয়ার, এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৬৭×১১৩ সেমি, ২০০২

জলের কলকল শব্দ সাগর বা নদীর জলের তরঙ্গ কখনো মরমী কখনো বা হরিষের সুরে গীতিময় হয়ে ওঠে। আমাদের সাধারণ বোধে হয়তো এই গীতের ভাবার্থ অনুধ্যান করা সম্ভব নয়। এটি একমাত্র শিল্পী ও কবির দ্বারাই সম্ভব। কারণ তাদের ভাবনায় অদৃশ্যমান শিল্পচেতনা ক্রিয়াশীল থাকে। নিরবতার মধ্যে এক ধরনের কথা বা গানের পংক্তি বা কবিতার সারি সৃষ্টিশীলতায় বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শিল্পী মনিরুল ইসলামের "ডায়ালগ ইন সাইলেন্স" (২০০২) বা নৈঃশব্দ সংলাপ চিত্রটির মধ্যে এই ভাবনার স্ফুরণ মূর্তিমান। তবে বিমূর্ত বিন্যাসে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ৪০×৫০ সেমি আয়তনে আনুভূমিকে চিত্রটি রচিত। চিত্রটি একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সমগ্র চিত্রটি প্রথমেই মনোজগতে জলরংয়ের ওয়াশমেজাজ ইঙ্গিতবহে নাড়া দিবে, জলরংয়ের স্বচ্ছতার এরূপ চিত্রের গড়ন আকর্ষণীয় ভাবনার জগতে টেনে নিয়ে যায়। ক্যালিগ্রাফি'র ছন্দায়িত অবয়ব, যা রেখার দোলাচলে সংগীতের তাল ও কথার সমন্বয় যোজনায় শিল্পী পারদর্শীতা দেখিয়েছেন। ক্যালিগ্রাফির বলয়ে ভঙ্গুর রেখা নমনীয় কালো, ধূসর, হালকা সবুজাভ বর্ণে প্রকাশ ঘটেছে। শিল্পী মনিরুল চিত্রতলে স্পেসকে ছেড়েছেন এমনভাবে যাতে সুরের বাতাস ইচ্ছেমতো দোলা দিয়ে যেতে পারে কথার ছন্দ ও লয়ে। চিত্রের উপরাংশে হালকা বাদামি বর্ণে ওয়াশ প্রধান বৈশিষ্ট্যে ভঙ্গুর অভঙ্গুর রেখা সরু ও মোটা ব্রাশিংয়ের ক্ষিপ্র আঁচড়ে "ফর্ম" বা আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। বামপার্শ্বস্থ ক্যালিগ্রাফি সমৃদ্ধ কম্পোজিশনের সঙ্গে ডানপার্শ্বস্থ কম্পোজিশনের মধ্যে একটা ভারসাম্যতা আনয়নে শিল্পীর নান্দনিক অনুভূতি তাৎপর্যময়ে ক্রিয়াশীল। উভয়

কম্পোজিশনের সুবিন্যস্ত অবয়ব রূপদানে সমুদ্র বা নদীর ঐকতানের গানের কথা নিরবতায় ধ্বনিত হচ্ছে, এখানেই শিল্পীর শিল্পকর্মের সারাৎসার সূচিত হয়েছে (চিত্র ১৭)।

সমুদ্র তীরের নীলাভ সৌন্দর্য শিল্পীকে ইন্দ্রজালিক মায়ায় কাছে টানে। শিল্পীও ঐ টানে সারা দিয়ে হৃদয়ের গহিনে সমুদ্রের নীলাভ শোভাবর্ধন কাব্যিকতায় সৃষ্টিতে নিমগ্ন হয়েছেন। এই বাসনায় নীল ও বাদামি বর্ণ লেপনে কোথাও কোথাও আকাশে মেঘলার সচলযাত্রার অবয়ব গড়নে শিল্পীর মন উদ্বেলিত। তাঁর "সমুদ্রে দূর্গ "(২০০৩) চিত্রটিতে এর প্রতিফলন দেখা যায় বিমূর্ত বিন্যাসে। ৭৪×১০৬ সেমি আয়তনে আনুভূমিকে নির্মিত। নীলাভ ও বাদামি বর্ণের পর্দান্তরের চিত্রতলে বেশিরভাগ স্পেস ছেড়ে শিল্পী ফর্মের খেলায় মত্ত হয়েছেন। চিত্রতলে উল্লম্বে সরলরেখা স্পষ্ট ও



চিত্র ১৭ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, ডায়ালগ ইন সাইলেন্স,
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৪০×৫০ সেমি, ২০০২

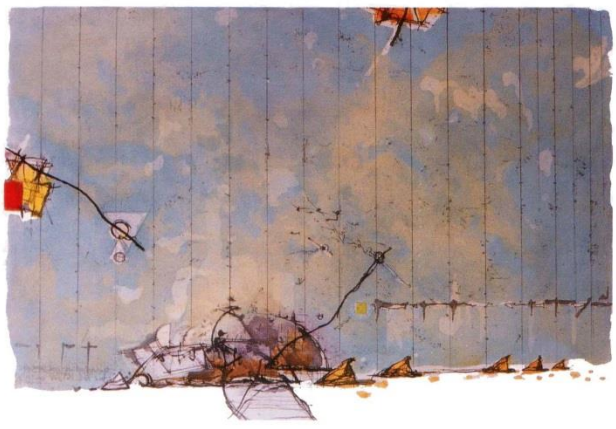

চিত্র ১৮ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, সমুদ্রে দূর্গ,
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৭৬×১০৬ সেমি, ২০০৩

অস্পষ্টতায় উদ্ভাসিত। চিত্রের বামপার্শ্বের কর্ণারে লাল ও হলুদ বর্ণের দুটি "ফর্ম" পরস্পর সন্নিবেশিত, একে ঘিরে আবার নমনীয়, ভঙ্গুর কালো বর্ণের রেখা চিত্রের ডানদিকের ত্রিভুজ ও বৃত্তাকার ফর্মকে ছেদ করেছে (চিত্র ১৮)। চিত্রের উপরিতল থেকে লাল-কমলা "ফর্ম" কালো বর্ণ রেখার দোলাচলে নিম্নমুখী। চিত্রের নিম্নাংশে ত্রিভুজাকৃতি কয়েকটি বস্তুর গড়ন দৃশ্যমান, যা হলুদ ও কালো বর্ণে উদ্ভাসিত হয়েছে। ধূসর বর্ণের হালকা স্তর বিন্যাসে সমুদ্রের সেতু নির্মাণে শিল্পী প্রয়াস পেয়েছেন। যেখান থেকে ছন্দায়িত কালো বর্ণের রেখা উপরেরদিকে একটি ছোট বৃত্তাকৃতি বস্তুকে ছেদ করেছে। সেতুকে কেন্দ্র করে অর্ধ বৃত্তাকার বলয় হালকা ও গাঢ় খয়েরি বর্ণে দূর্গের বিশেষ "ইলোশন" বা মোহ যোজনা হয়েছে। পুরোচিত্রটিতে একটি কাল্পনিক কাব্যিক অনুভূতি সর্বদা দোলা দিয়ে যায়। যাতে অদৃশ্য বস্তুর বলয়ে কাব্যিক ছন্দে চিত্রভাষা জন্মলাভ করেছে। একই সঙ্গে এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রকরণে যথারীতি অকল্পনীয় দক্ষতাপূর্ণের ছাপ দৃষ্টমান। 'ঝলকে ওঠে রং রেখা লতিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরে বর্ণের ভঙ্গুর আপ্তর, ভাঙ্গনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় অন্য রং; এভাবে পুরোছবি হয়ে ওঠে গীতিময় ভাষা। রঙের বিক্রিয়া আর রেখার প্রতিক্রিয়ায় কোনো অস্পষ্ট লোকের কবিতা রচনা করেছেন শিল্পী মনিরুল ইসলাম'।[৭]

উজ্জ্বল বর্ণ লেপনে শিল্পী মনিরুল "দি ফার্স্ট মেরেজ ডে" (২০০৪) বা প্রথম বিবাহবার্ষিকীর দিন চিত্রটি ২৮×৩২ সেমি আয়তনে আনুভূমিকে এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করেছেন। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীকে স্মৃতিময় করে রাখতে বিমূর্ত "ফর্ম" বিন্যাসে শিল্পী শিল্পকর্মের সারাৎসার সন্ধান করেছেন। উজ্জ্বল লাল বর্ণের হরিষের সুর ব্যঙ্গময় করে তোলতে শিল্পী প্রয়াসী হয়েছেন। উজ্জ্বল লাল বর্ণ, হলুদাভ ও নীলভ বর্ণের জমিনের ওপর কালো বর্ণে ছন্দায়িত, ভঙ্গুর-অভঙ্গুর বহুবঙ্কিম রেখায় হরিষের "ফর্ম" নৃত্যরত। এছাড়াও কোথাও কোথাও হালকা খয়েরি বর্ণ ছড়িয়ে আছে। একটি বলিষ্ঠ কালো বর্ণের আয়তকার জ্যামিতিক "ফর্ম" উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত–যা পুরোচিত্রের মধ্যে নান্দনিক ভারসাম্য যোজিত করেছে। এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্টের জোরালো প্রকরণে শিল্পীর নিখুঁত হাতের ছোঁয়ায় চিত্রটি আনন্দময় গীতের সুর-ধ্বনি চিত্রভাষায় প্রকাশ পেয়েছে (চিত্র ১৯)।



[৭] *তদেব*, পৃ. ১৪২।

চিত্র ১৯ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম দি ফাস্ট ম্যারেজ ডে
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট ২৮×৩২ সেমি, ২০০৪

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিজপ্রাণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন-ড্রাই অক্সাইড ত্যাগের মধ্যে দিয়ে নিরন্তর জীবন সঞ্চালিত। কার্বন-ড্রাই অক্সাইডেরঅভাবে গাছের যেমন প্রাণ সচল থাকেনা ঠিক তেমনি অক্সিজেন ব্যতীত মানুষের প্রাণ সচল থাকেনা, অর্থাৎ ভারসাম্যতা। এই ভাবেই অরণ্যে সারিবদ্ধ গাছপালার নৃত্য চলে যুগ-যুগান্তর। এই ভাবনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন শিল্পী মনিরুল ইসলাম "ফরেস্ট ড্যান্স'" (২০০৭) বা "অরণ্য নৃত্য" শীর্ষক ছাপাইকর্মে। চিত্রটির আয়তন ৭৬×১১২ সেমি, যা এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট এবং জলরং প্রক্রিয়ায় আনুভূমিকে নির্মিত। বৈচিত্র্যময় বর্ণে সারিবদ্ধ গাছের দেহময় নাচের ঢঙ-এ দৃশ্যমান। স্পেস ছেড়ে আনুভূমিক ফর্মের ভেতর গাছের সারিগুচ্ছ সুবিন্যস্ত এক নানন্দিক অনুভূতি সঞ্চার করেছে। অর্ধবিমূর্ত ধাঁচে শুধু গাছের অন্তর্ভেদ বহিঃপ্রকাশে অন্বিষ্ট হয়েছেন। চিত্রতলে সাদা স্পেস ছাড়া স্থানসমূহে জলরং ওয়াশ ধাঁচে ইমেজ সৃষ্টি করেছেন। যা গাছের বিমূর্ত ফর্মের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। প্রতিনিয়ত প্রকৃতি ভারসাম্যহীনতার শিকার হচ্ছে। মানুষ গাছ-গাছালী কেটে বসতবাড়ি বানাচ্ছে ফলে মানুষও অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ হারাচ্ছে। নিঃশ্বাসে মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়তে পারছে না বিধায় গাছ-গাছালী প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না। সবুজাভ নীলাভ, হলুদাভ খয়েরি আর কালো বর্ণ পর্দান্তরে চিত্রতলের পশ্চাৎপট হালকা খয়েরির তারতম্যে বিশেষ "ইলোশন" বা অধ্যাস যোজনা হয়েছে। প্রথম দর্শনে চিত্রটির টেকনিক বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। কেননা চিত্রটির আঙ্গিক গঠন কোন মাধ্যমে গঠিত হয়েছে জলরং না এচিং অ্যাকোয়াটিন্ট প্রক্রিয়ায়? তবে দুটো প্রক্রিয়ার এমন সন্নিবেশ যোজনা হয়েছে, যাতে শিল্পীর কারিগরি কৌশল দক্ষতার ছাপ যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর কম্পোজিশন ও বিশেষ আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের যোজনা জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জ্যামিতিক সাবলীল আনুভূমিক গড়ন সূক্ষ্মতার মাপকাঠিতে নির্মাণযোগ্য হয়েছে। সুমিত বিন্যাসে অকল্পনীয় শিল্পের রসাস্বাদনে অনন্য আকর্ষণীয় একটি নিটোল চিত্রকর্ম (চিত্র ২০)। শিল্পীর মনোবাসনায় এর যথাযথ রূপায়ণ নৃত্যের তালে তালে ছন্দময় প্রকৃতির বন-বনানী প্রাণময় হয়ে উঠেছে দক্ষিণা সমীরণে। 'স্থিরতার প্রতীক বৃক্ষ ও সেখানে নৃত্যপর হয়ে থাকে। 'নৃত্য ও অরণ্য' শীর্ষক ছবিতে একসার বৃক্ষ নাচছে। অরণ্যকে দৃষ্টি নামিয়ে দেখলে যেমন রূপ ধরা পড়ে। গতিময় আঁকাবাঁকা পায়ের মতো। প্রতিটি পা বা বৃক্ষকাণ্ড গতির একক। ছন্দের আর্তিতে এলোমেলো। মায়াময় পটভূমি সাঙ্গীতিকভাবে দৃশ্যমান'।[৮]

সূর্যোদয়ের প্রতিটি দিন যেন শিল্পীর কাছে নতুন নতুন শুভ কামনার জন্ম দেয়। শিল্পীর হৃদয়াকাশে সূর্যোদয় হয় বর্ণিল আবেশে। শিল্পী মনিরুলের এই মনোবাসনায় "সানরাইজ"

[৮] *তদেব*, পৃ. ১৪২-৪৩।

(২০০৭) বা সূর্যোদয় চিত্রটি ৩০×২০ সেমি আয়তনে উল্লম্বে নির্মাণ করেন। পুরোচিত্রের পশ্চাৎপট রিলিফ এচিং প্রক্রিয়ায় পেপারে অ্যাম্বোস বা উত্তল ইমেজ জ্যামিতিক নানা ফর্মের অবয়বে পরিস্ফুট। অর্ধবৃত্ত, বৃত্ত, সরল, ভঙ্গুর মোটা ও সরু রেখা নান্দনিকতায় উভিন্ন হয়েছে। এই পরিতলের ওপর এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্ট প্রক্রিয়ায় জলরং ওয়াশ আমেজে ব্রাশিংয়ে মোটা ছন্দায়িত রেখা ধূসর বর্ণে গাঢ়তার তারতম্যে আকীর্ণ। লাল বর্ণের ফোঁটা অবয়বটি চোখের দৃষ্টিকে কাছে টেনে নেয়। চিত্রের উপরাংশে বামপার্শ্বে অর্ধবৃত্তটি কমলা বর্ণের পর্দান্তরে, পশ্চাৎপটের উত্তলভাব চিত্রপটে ছড়িয়ে পড়েছে। যাতে হালকা কালো বর্ণে উল্টোভাবে ক্যালিগ্রাফি খঁচিত। চিত্রের মধ্যখানে কালো বর্ণে বৃত্তাকার বা "রিংক" বা বলয় এবং চিত্রের নীচেরদিকে বলিষ্ঠ ব্রাশিংয়ে সূক্ষ্ম ও মোটা রেখায় চিত্রটিতে গতিময়তা সঞ্চারিত হয়েছে (চিত্র ২১)।

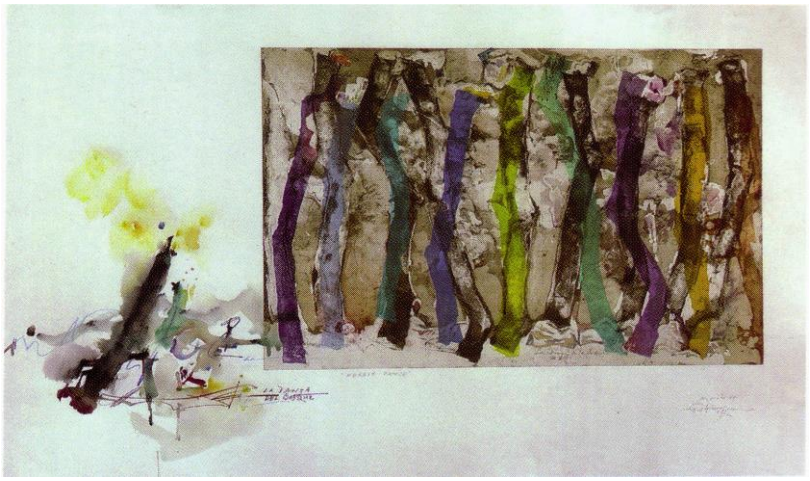

চিত্র ২০ : শিল্পী মনিরুল ইসলাম, ফরেস্ট ড্যান্স,
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট, ৭৬×১১২ সেমি, ২০০৭

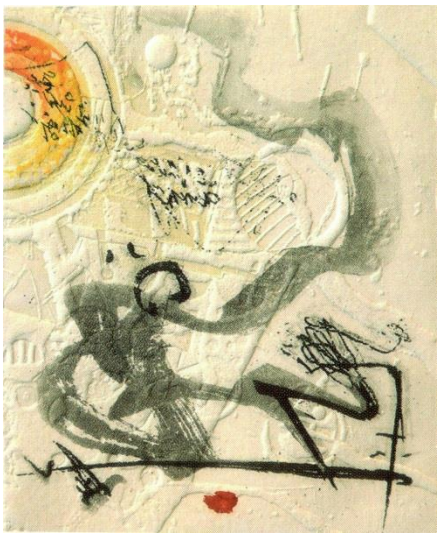

চিত্র ২১ : শিল্পী মনিরুল ইসলামসানরাইজ,
এচিং অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিন্ট ৩০×২০ সেমি, ২০০৭

শিল্পী মনিরুল ইসলামের চিত্রকর্মে প্রকৃতি থেকে আহরিত ঐক্যতা, ভারসাম্যতা ও সামঞ্জস্যতার মেলবন্ধন সূচিত হয়েছে। জ্যামিতিকতার বৈচিত্র্যময় প্রয়োগে ত্রিভুজ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, চর্তুভুজ, আয়তকার, বিন্দু ইত্যাদি ফর্মের সম্মিলনে এবং বর্ণিল আভায় নান্দনিক সহজিয়া অনুভূতি ছন্দময় ও কাব্যিক দোলাচলে আকীর্ণকরণে তিনি পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। চিত্রের প্রতিটি অনুষঙ্গসমূহ মূর্ত-বিমূর্তায়নে সাবলীল গতিশীলতায় অধ্যাসের রূপভেদ শিল্পবোধের অতল গহিন থেকে কুরে কুরে উদ্ভাসন করেছেন। যাতে দুঃখ ও আনন্দের অনূভূতিগুলো সহজ-সরল সুরের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সর্বদাই তাঁর শিল্পচর্চায় নির্দিষ্ট আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে বিশ্বাসী নন। চিত্রকর্মে আঙ্গিকের বাহুল্য প্রদর্শন শিল্পের প্রাণরস আনয়নে

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলে তিনি মনে

করেন। তিনি চিত্রকর্মে ফর্মকেই প্রাধান্য

দিয়ে এর মধ্য শিল্পের প্রাণরস সঞ্চারিত করেন। টেকনিক এবং শিল্পদর্শন যোজনায় তিনি সমগ্রচিত্রে অধ্যাস উদ্ভাসন করেন স্বকীয় কারিগরি দক্ষতায়। তাঁর ছবির বিষয়িক দর্শন সম্পর্কে তাঁর অপর অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে–

> আমি একই ট্রপিক-এর উপর যদি আমার সব ছবি আঁকতাম, একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টের উপর তখন আমি বলতে পারতাম আমার ফিলোসফিটা। এখন আমার পার্টিকুলার কোনো বিষয় নেই যে একটা সাবজেক্ট বা থটের উপর ছবি আঁকতেছি। সেটা হতে পারে একটা পোর্টফোলিও করলে একটা সাবজেক্ট বেছে নিতে পারব। ধরো এচিং এর উপর একটা পোর্টফোলিও করলাম, একটা থটের উপর ছবি আঁকলাম। এখন ছবি ফিলোসফিটা কি? আমার রিডিং হচ্ছে যে একটা ইমেজ হতে পারে বা আমার ইন্টোরিয়র সে থট সেটা যেভাবে আমার থটটাকে এক্সপ্রেস করতে পারি; উইথ লাইন, ড্রইং ফর্ম অথবা যেটা কিন্তু নট ইলাস্ট্রেটেট ওয়ে; আমি ছবিটা কার জন্য আঁকি ছবি বেশিরভাগ আমার নিজের জন্য আঁকি। অন্য কারো চাহিদার জন্য নয়। সেই চাহিদা যদি আমি আমার পিওর ও ওনেস্টি নিয়ে যতটুকু আমার ভেতরে আছে যদি আমার এক্সপ্রেশন, এখন মিডিয়া সব এক্সপ্রেশন কি আছে, লাইন আছে, রং আছে, ফর্ম আছে এগুলো দিয়ে ইনটেন্সিভ ওয়েতে যতটুকু ডেপ্‌থে যাওয়া যায় যদি ওই ভাব বা এক্সপেশনটা আনা যায় ওইটারে ধরো আমার পারসোনাল ফিলোসফির ছবি।[৬৯৯]

উপসংহার :

বিষয়ভাবনা ও টেকনিকে বৈচিত্র্যময় নতুন নতুন মাত্রা সৃষ্টি হতে থাকে তাঁর স্বকীয় শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে। তিনি কখনোই শিল্পকে কোনো বিষয় বা কৌশলের ঘেরাটোপে আবদ্ধ রাখতে চাননি।

[৯] শিল্পী মনিরুল ইসলাম, "গয়ার গ্রামের সন্তান", *শিল্পরূপ*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা , পৃ. ৩৩।

শিল্পীর মননশীলতা অবলোকন করার সূক্ষ্মদৃষ্টি, শিল্পবোধ উপস্থাপনার ক্ষমতা–এসব কিছু বিশুদ্ধ এক শিল্পজগতের সন্ধান দেয়। তাঁর শিল্পের বিন্যাসিত রূপ আপাত-বিশৃঙ্খলা কিন্তু দৃশ্যমান এক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। গঠনের অনুষঙ্গে রেখা পুরু বা সূক্ষ্ম প্রধানভাবে দেখা যায় এবং প্রায় ছবিতে সেই নেতৃত্ব। অর্থাৎ রং, বিন্দু, বাংলা বা ইংরেজিতে অংক বা কথামালা কাটাকাটি, বিন্দু ইত্যাদি বিভিন্ন রংয়ের উজ্জ্বল বিভায় স্পষ্ট ম্রিয়মান বা অপসৃয়মান হতে চায়। তাঁর ছবি সবসময় গতিশীল কর্মকাণ্ডে একধরনের সহজিয়া সারল্য শিশুসুলভ ক্রীড়ায় নিমগ্ন।[৭১] শিল্পী মনিরুল ইসলামের প্রায় প্রতিটি চিত্রকর্মে স্পেসের সমবন্টন, "ফর্ম" ও রংয়ে সমতা উত্থাপনে শিল্পিত মনোজগতকে সর্বদা ক্রিয়াশীল রাখেন। তিনি গভীরভাবে অনুধ্যান করেন, তাঁর স্বকীয় শিল্পবোধ যেনো তাঁর সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশের ব্যতিরেকে যে কোনো অনুষঙ্গের সরল উপস্থাপন সম্ভব নয়–এসব কিছু নিয়েই তাঁর শিল্পের স্বকীয় আঙ্গিক চিত্রভাষা সূচিত হয়েছে। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে অকল্পনীয় শিল্পীসত্তা। মনিরুল ইসলাম এক্ষেত্রে একজন সার্থক শিল্পী, যিনি বিশ্বছাপচিত্রকলার পরিমণ্ডলে নিজেকে এবং স্বদেশকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁর অন্তর্লীন মাধ্যমের শিল্পের সারৎসারের মহিমায়।